International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-IX, Issue-V, September 2023, Page No.71-79
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v9.i5.2023.71-79

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প : জীবনের বিচিত্র প্রবাহ

শোভা সাঁতরা
গবেষক, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন

Abstract:

Narayan Gangopadhyay started writing from an early age. His first writings were published in Masik Journal. He wrote regularly in newspapers like Sandesh, Mukul, Pathshala, Shuktara etc. He gained fame by writing Sunandar Journal in weekly country newspaper. During this time he wrote for adults in Anandabazar, Bichitra, Shanibarer Chithi and Chaturanga. His literary career began with poetry practice. He later wrote many short stories and novels. He also gained fame by writing short stories and novels. The emergence of Narayan Gangopadhyay as a versatile talent in Bengali literature on the eve of 2nd World War. Narayan Gangopadhyay is a well-known name in the history of Bengali short stories today. He is an independent artist of Bengali literature. Storyteller Narayan Gangopadhyay is a legendary literary critic as well as author of hundreds of short stories. His first story published in Desh Patrika is Nishither Maya. The first written novel was 'Timirtirtha' and the first published novel was 'Upanibesh'. His story 'Itihas' was awarded in the 'Kathashilpi' story competition. It is also the best story in his life. The author of many novels, short stories and dramas, Narayan Gangopadhyay's writings contain informative discussions about the diverse life and literary practices. The material gleaned from the country-time has become the subject of his stories, shedding light on that.

মূল শব্দ : প্রতিহিংসা, মনস্তত্ত্ব, আত্মহনন, ঈর্ষা, আত্মকথন।

আলোচনা: সাহিত্য কালের দর্পণ। তাই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও তাঁর সম-সাময়িক ছোটগল্পকাররা একই যুগ-মানসের অধিকারী হওয়ায় তাঁদের লেখায় অনেক সময় একই সমস্যা-চিন্তা-ভাবনার প্রতিফলন দেখা যায়। তাছাড়া এ যুগ একক সাহিত্য প্রতিভার যুগ নয়, সাহিত্য ক্ষেত্রেও গোষ্ঠীবদ্ধতার যুগ। তাই এ যুগের সাহিত্যিকরা পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ এবং স্বভাবতই একে অন্যের দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত। তাই এ যুগের অন্যতম সাহিত্য প্রতিভা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে জানতে হলে তাঁর সমকালীন অন্যান্য সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। তাছাড়া এই আলোচনা থেকে সমকালীন লেখকদের তুলনায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় স্বাতন্ত্র্য ও আবিষ্কার করা সম্ভব হবে বলে মনে হয়। প্রসঙ্গত সমকালীন গল্পকারদের আওতার

অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে আমি দুইজন লেখকের সঙ্গে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পের তুলনামূলক আলোচনা করছি।

প্রথমেই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সম-সাময়িক গল্পকার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গে আসছি। সাহিত্যক্ষেত্রে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এক বিস্ময়কর প্রতিভা। তাঁর লেখনী যেমন বলিষ্ঠ, তেমনি ধারালো। তাঁর মতে বিজ্ঞান ছাড়া সাহিত্য হয় না। তাই তাঁর লেখায় ভাবুকতা, রোমান্টিকতা প্রায় নেই। আছে যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী, বাস্তবনিষ্ঠ মন ও নেতিবাদ। এই নেতিবাদী চিন্তাধারার জন্যই মানিকবাবুর সাহিত্যিক সত্তা শেষ অবধি বেঁচে থাকতে পারে নি। শেষদিকে উৎকট উৎকেন্দ্রিক লেখা লিখে মানিকবাবু যেন অদৃশ্য বিধাতার উপর প্রতিশোধ নিতে চেয়েছেন। অপরদিকে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় যুক্তিবাদী হলেও রোমান্টিক এবং বাস্তববাদী হলেও ইতিবাদী। তাই তার সাহিত্য সম্ভার দিনে দিনে সমৃদ্ধ হয়েছে। জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিতে পার্থক্য থাকলে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহিত্যের বিষয় নির্বাচন ও সাহিত্য রচনার লক্ষ্য প্রায় একই। এঁরা দুজনেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ, বস্ত্রসংকট, কালোবাজারি, দুর্নীতি জনিত চরম অবক্ষয় ইত্যাদিকে গল্পের বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং উভয়েই এই সংকটের সময় মানুষের সংগ্রামী চেতনাকে জাগাতে চেয়েছেন। তাঁদের গল্পগুলিকে বিশ্লেষণ করলে অনেকসময় দেখা যাবে একই ঘটনা একইভাবে তাঁদের শিল্পী মনকে নাড়া দিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুঃশাসনীয়' ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'দুঃশাসন' গল্প দুটি যেন একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। এই গল্পদুটির নামকরণেই কেবল সাদৃশ্য নেই। গল্পদুটি একই বিষয় বস্ত্রসংকটকে কেন্দ্র করে রচিত এবং গল্পদুটি রচনার উদ্দেশ্যও অভিন্ন। এই গল্পদুটির মধ্যে পার্থক্য প্রধানত এই যে দুঃশাসনীয় তে আছে শুধু বস্ত্রসংকট, আর 'দুঃশাসন' গল্পে প্রধানত বস্ত্রসংকট থাকলেও সেই সঙ্গে আছে কেরোসিন সংকটের নির্মম চিত্র। 'দুঃশাসনীয়' গল্পে প্রতিবাদ আছে। প্রতিরোধ নেই। আর 'দুঃশাসন' গল্পে আছে আসন্ন বিপ্লবের আভাস।

এবার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখার তুলনামূলক আলোচনা করছি। সাহিত্যক্ষেত্রে জনপ্রিয়তা ও গুণগত উৎকর্ষের দিক থেকে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় একজন প্রথম শ্রেণীর লেখক। 'কল্লোল' যুগের লেখক হয়েও তিনি কল্লোল-গোত্রীয় হতে পারেননি। তিনি এ যুগের ছোটগল্পের ক্ষেত্রে এনেছিলেন এক নতুন স্বাদ-জল, মাটি, মানুষ, পশুর ভালবাসার স্বাদ। এই প্রসঙ্গে শ্রী ভূদেব চৌধুরী তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার' নামক গ্রন্থে বলেছেন- 'কল্লোল' গোষ্ঠীর শিল্প চিত্ত যেখানে ঊর্মিল উত্তালতার প্রখর অস্বীকৃতির তথা একান্তভাবে প্রত্যয়ভঙ্গের আমোদ উল্লাসে উদ্দাম হয়ে উঠেছিল তারাশঙ্কর তখন মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে চেয়েছেন এক কল্যাণ-স্নিগ্ধ সত্য-সুন্দর জীবন পরিণামে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা আঞ্চলিক। রাঢ় অঞ্চল প্রধানত বীরভূম জেলাকে কেন্দ্র করেই এই আঞ্চলিকতা গড়ে উঠেছে। এই অঞ্চলের প্রকৃতি, কাহিনী-কিংবদন্তী এবং আদিম মানুষের তাঁর সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। তাঁর গল্পগুলি হল 'ছলনাময়ী', 'রায়বাড়ি', 'নারী ও নাগিনী', 'বোবা কথা', 'দেবতার ব্যাধি', 'ডাইনী', 'বেদেনী', 'অগ্রদানী' ইত্যাদি গল্পে তান্ত্রিক জীবন রসের রৌদ্র বীভৎস ভয়ানক স্বাদুতাই একান্ত হয়ে উঠেছে।

তারাশঙ্কর এবং নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় উভয়েই স্থানীয় ঐতিহ্য, গল্প-কাহিনী-কিংবদন্তীকে গল্পে স্থান দিয়ে অতিলৌকিক ও বীভৎস রস সৃষ্টি করেছেন। এ প্রসঙ্গে তারাশঙ্করের 'বেদেনী', 'যাদুকরী', 'ডাইনী',

'অগ্রদানী' প্রভৃতি গল্প এবং নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'হাড়', 'মর্গ', 'টোপ', 'জাগ্রতা' প্রভৃতি গল্প উল্লেখযোগ্য। তারাশঙ্করের 'ডাইনি' গল্পটি কুসংস্কার ভিত্তিক হলেও অদ্ভুত বলিষ্ঠতার অনুভূতির তীক্ষ্ণতায় আর পরিবেশের রুদ্রতায় সমস্ত গল্পটিতে যেন অতিলৌকিক পরিবেশ গড়ে উঠেছে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'জাগ্রতা' গল্পটিও কুসংস্কারভিত্তিক। কিন্তু পরিবেশের ভয়ঙ্করতার, বর্ণনার রুদ্রতায় সমস্ত গল্পটিতে যেন অতিলৌকিক পরিবেশ গড়ে উঠেছে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'জাগ্রতা' গল্পটিও কুসংস্কার ভিত্তিক। কিন্তু পরিবেশের ভয়ঙ্করতার, বর্ণনার রুদ্রতার ও অনুভূতির সূক্ষ্ম রহস্যময়তায় এই গল্পটিতে গড়ে উঠেছে অতিলৌকিকতা পরিবেশ।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এই দুজনের লেখাই অশ্লীলতা মুক্ত। যৌনতার কদাচার তাঁদের নেই। এক প্রসন্ন কল্যাণময় শিল্পচেতনা এঁদের রচনার গভীর কাজ করেছে। তাই বেদেনীর নিরাবরণ নৃত্য ও তারাশঙ্করের রচনায় অশ্লীল নয়। আর আদিবাসী রমনীর নৃত্যও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখায় অশ্লীলতা মুক্ত।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পের বিষয় বৈচিত্র্য সত্যই বিস্ময়কর। কেবল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সমকালের বিষয়গুলি নয় যুগ নিরপেক্ষ যেকোন তুচ্ছ বিষয় ও তাঁর ছোটগল্পে অনায়াসে স্থান পেয়েছে। ছোটগল্পের চিরন্তন বিষয়বস্তুকে তিনি তাঁর ছোটগল্পে উপযুক্ত মর্যাদা দান করেছেন। তাই তাঁর ছোটগল্পে সমকালীন মন্বন্তরের 'হাড়' চোষার বুভুক্ষুতা থেকে ট্যাক্সিওয়ালার সামান্য সাধ, বনজ্যোৎস্নায় ভেসে যাওয়া বন-বালার প্রেম তার চিরন্তন সাহিত্য-মর্যাদা নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। কখনো ক্লেদাক্ত সমাজের বীভৎসতে নারীর 'ইজ্জৎ' বাঁধা পড়েছে। কখনো রায় বাহাদুরের 'টোপ'-এ বিকৃত উচ্চবিত্তের বীভৎস শখের উল্লাস ধ্বনিত হয়েছে, আবার নীতিচ্যুত মানবের চেতনায় হয়েছে আদর্শবাদীতার 'সঞ্চার', কখনো বা মানসিক জটিলতা 'সেই পাখিটা'র রূপকে উড়ে গিয়ে বসেছে 'শেষচূড়ায়। এককথায় বলা চলে, সমকালীন সমাজ-সমস্যা, রাজনৈতিক চেতনা, দার্শনিকতা, বাস্তবতা, রোম্যান্টিকতা, ইতিহাসবোধ, মানসিক জটিলতা প্রেম, প্রকৃতি সবই তাঁর ছোটগল্পের বিষয় হয়ে উঠেছে। 'দুঃশাসন' গল্পে বস্ত্রসংকট, 'হাড়' গল্পে মন্বন্তর। 'কালো জল' গল্পে নারী পাচারের সামাজিক চক্রান্ত, 'নীলা' গল্পে শ্রমিক-বিপ্লবের রাজনৈতিক আভাস, 'ভাঙা-চশমা' গল্পে শিক্ষাজগতের আদর্শচ্যুতি, 'খা' গল্পে শোষক-শ্রেণীর হাতে উদ্যত খঙ্গের রক্ততৃষ্ণা। 'ইতিহাস' গল্পের ইতিহাস-চেতনা, 'ভাঙা-বন্দর' গল্পে নূতন ও পুরাতন যুগের টানাপোড়েন, 'অমনোযোগীতা' গল্পের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা - এসব বিচিত্র বিষয় তাঁর গল্প সম্ভারকে সমৃদ্ধ করেছে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পের এই বিষয়-বৈচিত্র্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে সুন্নাত দাশ বলেছেন 'নিম্নমধ্যবিত্ত, দাঙ্গা দেশবিভাগের বলি লক্ষ লক্ষ নিরন্ন, ছিন্ন মানুষ। গ্রাম বাংলার ক্ষেতমজুর। তেভাগা আন্দোলনের লড়াকু কৃষক। চটকলের শ্রমিক কিছুই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহিত্য থেকে বাইরে নেই। গল্পের শ্রেণীবিভাগ:

ক) পটভূমি ও প্রকৃতি খ) রাজনীতি গ) মনস্তত্ত্ব

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রায় বেশিরভাগ গল্পেই প্রকৃতির বর্ণনা ও পরিবেশ রচনার আগ্রহ আমরা লক্ষ্য করি। জীবনের প্রতি গভীর আসক্তি এবং মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা থাকলেও মূলত রোমান্টিক আবেগের প্রতি তাঁর ঝোঁক ছিল বেশি। প্রগতিশীল ভাষা, কাব্যময় আবেগতপ্ত রোমান্টিকতা, পরিবেশ রচনার কুশলতা, তীক্ষ্ণ ব্যঞ্জনা ও চিত্রধর্মে তাঁর গল্পগুলি স্বাভাবিক ক্ষিপ্রতায় পাঠকমনে সঞ্চারিত হয়ে যায়। গল্পের কাহিনী, ঘটনা

বা চরিত্রের পাশাপাশি তার পরিবেশ সক্রিয় এবং বলিষ্ঠ ভূমিকায় হাজির হয়। গল্পের পটভূমি যেখানে নিরাবরণ, অসংস্কৃত, আদিম ও রহস্যময় গল্প তার যাবতীয় অনুষঙ্গ নিয়ে সেখানে বলিষ্ঠ, সতেজ এবং জীবন্ত হয়ে ওঠে। মানুষের জীবনলীলার নিয়ন্ত্রণে প্রকৃতিকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে দেখি। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে প্রকৃতি নিয়ে কয়েকটি গল্পে আলোচনা।

'বনতুলসী'[১] গল্পে মানুষ এবং প্রকৃতির সর্বগ্রাসা প্রেমকে গল্পকথকের উপলব্ধিতে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। নারী এবং প্রকৃতি এখানে সমধর্মী। গল্পের প্রথম অংশের পটভূমি বিপুল ব্যাপ্ত নিঃসঙ্গ পৃথিবী। নায়কের কিশোর বয়সের স্বপ্নাচ্ছন্ন মাদকতা আর প্রকৃতির উদাত্ত আহ্বান এই পটভূমিতে এসে মিলিছে। এখানে 'খোলা আকাশের সোনালী রোদ রক্তের মধ্যে মদের ক্রিয়া করে। বয়ঃসন্ধির কিশোর বনতুলসীর মঞ্জরী ছিঁড়ে দুহাতে ডলে ডলে তার ডাংলা কথায় 'অরণ্য-গন্ধ' মেখে জৈবসুখ অনুভব করে। আর বনতুলসীর তীব্র জংলা গন্ধের পটভূমিতে এক বন্যবালিকার আবির্ভাব ঘটেছিল। কিন্তু সেই তুরী বালিকাটি অদৃশ্য হয়ে গেলেও রক্তের ভেতরে চারিয়ে গিয়েছিল বনতুলসীর গন্ধ। "আমি বনতুলসীর প্রেমে পড়েছিলাম। বনতুলসীও যে আমাকে ভালোবেসে ফেলেছে তা কি বুঝতে পেরেছিলাম কোনদিন?" শ্বাসরোধকারী ভয়ানক মৃত্যুর অনুভূতির সঙ্গে সংগ্রাম করতে করতে তাঁর চেতনা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হল। সে যাত্রা তাঁকে অজ্ঞান অবস্থায় উদ্ধার করেছিল তাঁর বন্ধু। অভিজ্ঞতার আলোয় প্রতিপাদ্য বিষয়টিকে প্রমাণ করেছেন গল্পকথক - মানুষের মতো প্রকৃতিপ্রেমও সর্বগ্রাসা। এবং মানুষের প্রেম তুলনামূলক ভাবে ভালো। কেননা 'প্রকৃতির মতো মানুষের পৃথিবী যেখানে নিষ্ঠুর আলিঙ্গনে নিজের ভেতর একেবারে অবলুপ্ত করে নেবে না।

'বনজ্যোৎস্না'[২] গল্পটির পটভূমি এমনই, জ্যোৎস্নার মাতাল করা পূর্ণিমা রাতে, জলঢাকা নদীর তীরে, ভুটানী মেয়ে শিউকুমারী, পলাতক বাঙালি বিপ্লবী মহীতোষকে আবিষ্কার করে। শিউকুমারীর প্রাথমিক পরিচর্যার জ্ঞান ফিরে পেয়ে মহীতোষ তার সামনে মর্মরশুভ্র বিদেশিনী রহস্যময়ী তরুণীকে দেখে তার কালো চোখে জ্যোৎস্না, সুন্দর মুখখানিতে জ্যোৎস্না, কর্নাভরণে জ্যোৎস্না...'। দিনের বেলায় 'অপগত ক্লান্তি সুস্থ শিক্ষিত মহীতোষের স্বপ্নভঙ্গ হয়। বনজ্যোৎস্নায় যাকে অপরূপ স্বপ্নময়ী বলে মনে হয়েছিল। দিনের উজ্জ্বল আলোর দেখা গেল ততটা সুন্দরী সে নয়। তবুও সেই রহস্যময়ী নারী আর রহস্যময়ী প্রকৃতির কুহকী মায়ার শৃঙ্খলে সম্মোহিত পুরুষ বন্দী হয়ে পড়ে। নিজের কর্তব্য বিস্মৃত হয়। মুক্তি চায়, পায়না। 'মোহ কাটাতে চায় মহীতোষ। কিন্তু মোহ কি সত্যি কাটে?' কারণ 'অদৃশ্য শয়তানের শৃঙ্খলে' বেঁধে প্রকৃতি যেন মানব চরিত্রকে পরিচালিত করে।

'ঘাসবন' 'ঘাসবন' গল্পে দিগন্তজোড়া আদিম প্রকৃতির মাঝখানে মানবমনের রহস্যময়তা, জৈব মনস্তত্ত্ব এবং আদিম হিংস্রতার পরিচয়। এই গল্পের পটভূমিও উত্তরবাংলা। কাঞ্চন নদী তীরবর্তী বিস্তীর্ণ গোচারণ ভূমি। দিকদিগন্ত জোড়া আদি অন্তহীন কোমর সমান উঁচু ঘন শ্যামল ঘাসবন। এই বিস্তীর্ণ ঘাসবনের মাঝখানে কঠিন লালমাটির একটুকরো ভয়াল 'ন্যাড়া জঙ্গল', সেখানে ভয়ংকর সাপের আস্তানা। চারপাশে সবুজের ঐশ্বর্যের রমনীয়তার মাঝে কঠিন। হিংস্রতার আশ্চর্য সহাবস্থান।

এই পরিবেশে গল্পের নায়ক-নায়িকার সাক্ষাৎ হয়। একজন মহিষবাথানোর মালিক। বাইশ বছরের শক্ত জোয়ান গোঁয়ার যুবক শ্যামলাল। অন্যজন গাঁজাখোর, আধবুড়ো হিন্দুস্থানি ঘাটোয়ালের মেয়ে রুকনি। মানুষ, পশু আর প্রকৃতি এখানে গলাগলি করে থাকে। চারদিকের এই আশ্চর্য আর অপরূপ পৃথিবী' শ্যামলালকে মুগ্ধ করে। রুকনির খিলখিল হাসি আর শ্যামলালের আচ্ছন্নতা পরস্পরকে কাছে আনে। কেননা

এই অনাবৃত আদিম পৃথিবীতে অনাবৃত অনায়োজন সহজ ভালবাসা। শ্যামলাল রুকনিকে বিয়ে করে পালিয়ে যেতে চায়। কিন্তু তার 'সমস্ত নাড়িতে নাড়িতে জড়িয়ে আছে বাথানের প্রতি অন্ধ দুর্বলতা। সুতরাং মনের ভেতরে অসহ্য অস্বস্তি। সে বিয়ের কথা বলতে চায়, বাধা দেয় রুকনি। পরে জানা যায়, রুকনি বিবাহিতা। শ্যামলাল কষ্ট পাবে বলে সে তা জানায়নি। শ্যামলাল একথা শোনার পর রুকনিকে ছিটকে দেয়নি। দিগন্তজোড়া মুক্ত মাঠের ভেতরে এমনি নির্ভাবনার ভালোবাসাই তো ভালো। অপরূপ এই প্রকৃতির আড়ালে যেমন আত্মগোপন করে থাকে আদিম হিংস্রতা। এই মুক্ত ভালোবাসা তেমনি পরিণত হয় নির্মম হত্যায়। আদিম বন্য পৃথিবীতে প্রেম-অপ্রেম, এই মুক্ত ভালবাসা তেমনি পরিণত হয় নির্মম হত্যায়। শ্যামলালের অনুরোধে পরদিন রুকনি নতুন রাঙা শাড়ি পরে আসে। আর শ্যামলাল আনে বাথানের সবচেয়ে হিংস্র, প্রকাণ্ড শিংওয়ালা বেয়াড়া মহিষটাকে। মহিষের শিংজোড়া যখন রুকনির ক্ষতবিক্ষত শরীরের রক্তে মাখামাখি হয়, শ্যামলাল নির্লিপ্তভাবে পিছন ফিরে বিড়ি ধরায়। অরণ্যপ্রকৃতি, বন্য পশু আর প্রাকৃতিক মানুষ এই গল্পে মিলে যায়। এই বিস্তীর্ণ ঘাসবনে প্রেম, ভালোবাসা, হিংসা, হত্যা সবই যেন সহজ ও স্বাভাবিক। সব নিয়ে জেগে থাকে একটিই অস্তিত্ব - এই ঘাসবন।

'জান্তব' গল্পে চিরপুরাতন, আদিম জীবনলীলা হিমালয়ের দুর্গম প্রকৃতির মাঝখানে নিজেকে যেন নগ্নভাবে মেলে ধরেছে। ভীষণ, ভয়ংকর, প্রতিকূল প্রকৃতির মধ্যে 'সুখে দুঃখে প্রেমে বিরহে এবং সংঘাতে জান্তব জীবন বাঁচিয়ে রাখে মানুষ। খাড়া পাহাড়, দুর্ভেদ্য জঙ্গল, তুষার ঝড় ও ঘন কুয়াশায় মানুষের বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা আরও উগ্র ও অদম্য হয়ে ওঠে। গুম্ফা লামা এখানকারই এক গুহাবাসী। দুর্বোধ্য অমানুষিক মানুষ। তার জীবনের একমাত্র সঙ্গী প্রকাণ্ড এক কুকুর - 'গুম্ফা লামার নিভৃত নিঃসঙ্গতায় পৃথিবীর একমাত্র প্রেম। একবার হিমালয়ের বুকে হিংস্রতার আক্রোশে শুরু হয়ে যায় ভয়ঙ্কর প্রলয়। তীব্র শীতার্ত তুষার বৃষ্টি আর ঝড়। গুহার ভিতরে জন্তু এবং জান্তব মানুষের একটুখানি উষ্ণতার জন্য শুরু হয়ে যায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা - পৃথিবীর বুকে বেঁচে থাকার প্রাথমিক শর্ত টিকে থাকার লড়াই।

হিংসা ও প্রেমের যুগ্ম প্রবাহে পৃথিবীর জীবনলীলা নিত্য বহমান। রহস্যময়, দুর্গম হিমালয়ের প্রকৃতি এই জীবনলীলার চিরন্তন সত্যকে পালন করে চলে। গল্পকারের নিপুণ, নির্মোহ বর্ণনাভঙ্গিতে তা যথার্থভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

রাজনৈতিক / রাজনীতি গল্প: সমাজ-সচেতন শিল্পী সমকালীন রাজনীতির দ্বারা প্রভাবিত হন এবং দেশ ও জনসাধারণ সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও বক্তব্য সাহিত্যে প্রতিফলিত হয় রাজনৈতিক গল্পের সৃষ্টি করে। বিশেষ রাজনৈতিক পটভূমিতে রচিত হয়। এই জাতীয় গল্প এবং বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রচার বা গভীর রাজনৈতিক তাৎপর্য থাকে গল্পটির গভীরে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় নিজে সাম্যবাদী মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত রাজনৈতিক আদর্শের ছায়াপাত ঘটেছে তাঁর কিছু রাজনৈতিক গল্পগুলিতে। তাঁর কিছু রাজনৈতিক গল্প এবার আলোচনা করছি -

'নীলা' নীলার রূপকে শ্রমজীবী সাধারণ শোষিত মানুষের সংঘাতের কথা আছে ও সেইসঙ্গে আছে সাম্যবাদের প্রচার। পুঁজিবাদী বুর্জোয়া সমাজ বাংলাদেশ ও তার দরিদ্র মানুষকে নির্বিচারে শোষণ করেছে। ভাস্করের ব্যক্তিসত্তাকে ছলনার জলে জড়িয়ে গ্রাস করে কুন্তলা। ভাস্করের শিরায় শিরায় রক্তের কলধ্বনি বেজে ওঠে জোয়ারের জলের মতো। শ্রমজীবী শোষিত দরিদ্রের স্বার্থে, শ্রমিক নেতা কান্তিকে ভালবাসার

তাগিদে কুণ্ডল ভাস্করের শরীরের প্রান্তে সেতারের মীড়ের স্পন্দন জাগায়। আর এমন মধুর রোমাঞ্চকর মুহূর্তে সে ভাস্করকে শ্রমিকদের দাবি মেনে নিতে অনুরোধ করলে মন্ত্রচালিত পুতুলের মতন ভাস্কর তা পালক করে। গল্পের চরমক্ষণ আসে এখানেই।

কারোর ভাগ্যে নীলা সয়, কারোর বা সয় না। যার সয়, তার চড়চড় করে উন্নতি হয়। আর যার সয় না তার কাছে নীলা এক সর্বনাশা বিষ, যা স্পর্শ করলেই অপমৃত্যু। তাই এ গল্পের নামকরণ প্রতীকী তাৎপর্যমণ্ডিত ও ব্যঞ্জনাময় । এ গল্পে লাবণ্য-স্নিগ্ধ কুন্তলার চোখ নীলার মতো উজ্জ্বল ও শানিত। সুতরাং রাজনৈতিক আদর্শবাদের ছায়া ও গল্পের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে আবিষ্কার করা যায়।

'দুঃশাসন' [৩] গল্পে কাপড়ের আড়তদার দেবীদাসী যাত্রার আসরে দুঃশাসনের রক্তপান-এর অভিনয় দেখে তার স্বরূপ ও পরিণাম সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠল; পাপকর্মীর অন্তর্নিহিত দুর্বলতাবশেই সূর্যের আলোয় ঝিকিয়ে ওঠা শ্রমিকদের হাতে ধারালো হেসোগুলো দেখে ভীতিবিহ্বল হয়ে সে ভাবতে লাগল, যে দুঃশাসন বাংলাকে বিবস্ত্রা করেছে, তারও কি প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে একদিন? তাকেও কি রক্ত দিতে হবে কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে? এ গল্পের শিল্পকৌশল কথাকতর ভঙ্গি আশ্রয় করেছে। দ্রৌপদীর বস্ত্রহারী দুঃশাসনের নিধন-প্রসঙ্গ অবলম্বনে রচিত যাত্রার অভিনয় বর্ণনার মধ্য দিয়ে শুধু দেবীদাসের মানসপ্রতিক্রিয়াই নয়। ভবিষ্যতের রাজনৈতিক বিদ্রোহের ঝলকানি দেখেছে আর ভেবেছে তাকেও কি রক্ত দিতে হবে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে ঐ বস্ত্রহরণকারী দুঃশাসনের মতো? গল্পটি বাণের মতোই একলক্ষ্যভেদী। বিশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে উদ্ভূত সমস্যার রাজনৈকি সমাধানের পথ ইঙ্গিতে গল্পে স্পষ্ট।

গল্পটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধচলাকালীন জাপানী বোমার ভায়ে কলকাতায় যে ব্ল্যাক-আউট চলছিল, সেই বিশেষ রাজনৈতিক পটভূমিতে রচিত। গল্পটি একটি রাতের ঘটনা নিখুঁতভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এখানে আশ্রয়হীন 'নিশাচর' এক স্বদেশীর কথাই মুখ্য। ঘরের নিশ্চিত সুখশয্যা ছেড়ে ব্ল্যাক আউটের বিপদ সংকুল পরিস্থিতিতে অন্ধকারে পথ হাতড়ে ফেরে বাঙালী যুবক। কখনো মাঠে খোঁড়া উনুনের গর্তে সে আশ্রয় নেয়। কখনো বারবণিতার ঘরে, কখনো বা মড়ার খাটিয়ায়। ভয়সংকোচ ঘৃণা কিছুই তাকে স্পর্শ করতে পারে না। হিমেল বাতাসের তীক্ষ্ণতা, বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা, ক্ষুধা, অনিদ্রা কিছুই তার পথরোধ করতে পারে না। প্রাণের মায়া তার নেই। কিন্তু পুলিশের চোখ এড়িয়ে বাঁচতে চায় সে। কারণ ইস্তাহারের কাগজ তাঁকে জনগণের হাতে পৌঁছে দিতেই হবে। আসলে সেও স্বদেশীদের মতো দেশকে ভালোবাসে ও তারজন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ।

সাম্যবাদী রাজনীতিতে বিশ্বাসী এক যুবকের জীবন এক রাত্রির পটভূমিতে গল্পটিতে উদ্ভাসিত। সাম্যবাদী লেখকের বামপন্থী জীবনদর্শের গল্পটিতে প্রতিফলিত। এখানে যুবকটি সমস্ত বামপন্থীদের প্রতিনিধিস্বরূপ।

'ইতিহাস'[৪] গল্পেও বিয়াল্লিশের আগস্ট আন্দোলন এবং মেদিনীপুরের বন্যা একটা উপলক্ষ মাত্র। দেবদূতের আত্মদান অকালবোধনের পূজায় ব্যর্থ বলিতে পর্যবসিত হয়েছে কি না সে প্রশ্নও এখানে অবান্তর। এমনকি যে অমরেশ বার্ধক্যে পুত্রকে ঘিরে একটি পরিপূর্ণ সংসারের কামনা করেছিলেন। তাঁর মর্মান্তিক পুত্রশোকও এখানে গৌণ হয়ে উঠেছে। পতন-অভ্যুদয় পন্থার ইতিহাস তার নিজের কাহিনী রচনা করে চলেছে, অতীত থেকে বর্তমান। বর্তমান থেকে ভবিষ্যৎ। সেই চিরন্তন যাত্রাপথে এক একটি ঘটনা এক

একটি পদচিহ্নের মত। সে পদচিহ্ন জ্বলজ্বল করে জালিয়ানওয়ালার, সেবাগ্রামে, কর্ণফুলির তীরে, বুড়ি-বালামের অরণ্যে, মেদিনীপুরে রাঙামাটিতে। ভাবীকালের পথ-নির্দেশ সেই রক্তলিপিতে। সে রক্তলিপি রচনা করে চলেছেন ঐতিহাসিক অমরেশ। দেশজননীর পূজার ঋত্বিক 'পুরোহিতের' মতো তাঁর কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হচ্ছে মাতৃমন্ত্র। ইতিহাসের মহৎ প্রেরণা অপরাহ্নের উৎসাহের আনন্দরস হয়ে ক্ষরিত হচ্ছে তাঁর কণ্ঠে। নিজের হৃৎপিণ্ড ছিন্ন করে তিনি মাতৃপূজার পূর্ণাহুতি দিয়েছেন বলেই তাঁর কণ্ঠোচ্চারিত মাতৃবন্দনা মন্ত্র হয়ে উঠেছে।

গল্পটিতে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক আদর্শের প্রতিফলন স্পষ্ট। গণশক্তিতে উদ্বুদ্ধ ও সাম্যবাদী বিপ্লবের পূজারী লেখকের রাজনৈতিক আদর্শ এই গল্পে ইতিহাসের বেদীতে প্রতিষ্ঠিত। লেখকের ইতিহাস চেতনা ও আদর্শপ্রাণতার প্রমাণ মেলে তাঁরই 'সাহিত্যে ছোটগল্প' গ্রন্থে। সেখানে তিনি বলেছেন- 'ইতিহাসই নির্ধারণ করুক ভবিষ্যতের ছোটগল্প কোন লক্ষ্যকে বেছে নেবে। মনের জগৎকে সে তন্ন তন্ন করেই সন্ধান করুক - কিন্তু সামাজিক দায়িত্ব ও কি তার থাকবে না? তাঁর সাহিত্য ও আদর্শ' প্রবন্ধে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় স্পষ্টই বলেছেন 'সাহিত্য জাতীয়ই হোক, আর আন্তর্জাতিকই হোক, এই যুগসন্ধির লগ্নে তাকে আদর্শবাদী হতেই হবে। না হয়ে উপায় নেই।' এই রাজনৈতিক আদর্শেরই বিকাশ ঘটেছে ইতিহাস গল্পে।

মনস্তাত্ত্বিক: মনস্তাত্ত্বিক ছোটগল্পই আধুনিক ছোটগল্পকারদের সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। প্লট রচনার চেয়ে হৃদয়ের নিগূঢ় রহস্যের গর্ভে উকিঝুঁকি মারতেই বর্তমান লেখকরা ব্যস্ত হয়েছেন বেশি। বিংশ শতকের মাঝামাঝি জটিলতা, যন্ত্রণা, দ্বিধা, সন্দেহ, গল্পের চরিত্রে বাসা বেঁধেছে। অসুস্থ মনোবিকারের নগ্ন অশ্লীলতা নয়, মানব-মনের গহনের অজস্র জটিল লুতাতত্ত্ব নিয়ে গল্প রচনা করেছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। মানব মনের তিনটি স্তর-চেতন, প্রাক চেতন ও অবচেতনে অনায়াসে যাতায়াত করে তিনি হৃদয়ের বিচিত্র রূপকে তুলে এনেছেন লেখনী মুখে। তাঁর এই জাতীয় গল্পগুলিতে বিশ্লেষণ তো আছেই, সর্বোপরি আছে মমত্ববোধ, - যার গুণে এগুলি প্রবন্ধ নয়; গল্পের নিটোল রসরূপ লাভ করেছে। তাঁর মনস্তত্ত্বমূলক কিছু গল্প আলোচনা করে আমার উক্তি স্বপ্রমাণিত করার চেষ্টা করছি।

"সুখ" কথাটি যে মানুষ কত বেদনায়, যন্ত্রণা বিকৃত শ্লেষের সঙ্গে উচ্চারণ করতে পারে, এ গল্পে তা-ই দেখা যায়। ব্যর্থ তুহিনাংশু দত্ত চৌধুরী তাঁর ব্যর্থতাজনিত অক্ষম ক্রোধে ফেটে পড়েছেন ও তারই পরিণামে দেখা দিয়েছে আত্মপীড়নের প্রবণতা। ফলে জন্ম হয়েছে 'পাগলা চৌধুরীর'। শিক্ষিত হয়েও তাঁর আলাপ অশিক্ষিত চাষা-ভূষোদের সঙ্গে। বনজ-ভেষজ ওষুধ তৈরি করার জন্য ভয়াল নির্জন পরিবেশে সাপের ঘোলস কুড়িয়ে বেড়ান। টিনের ছোট্টো বাড়ি, কিছু তরি-তরকারি, ছ'টা হাঁসের ও মুরগীর সমন্বয়কে তিনি গর্ব করে বলেন 'মডেল ফামিং'। এভাবেই শরীরকে হত্যা নয়। আত্মাকেই তিলে তিলে মৃত্যুর পথে ঠেলে দেবার সাধনা তাঁর। - চিরকাল কি এরকম করে একটা পাথরের তলায় সব চাপা পড়ে থাকবে? কবিতা হারিয়ে যাবে মনিকা হারিয়ে যাবে যেখানেই যাব। এই পাথরের হাত থেকে আমি মুক্তি পাবনা?' গল্পটি 'সুখ' নামকরণ তাই অত্যন্ত শ্লেষাত্মক, ট্রাজিক ও তাৎপর্যময়। আর গল্পটির ছত্রে ছত্রে মনোবিকারের করুণ ও তীক্ষ্ম যন্ত্রণা স্পষ্ট। গল্পটির শেষাংশে তুহিনাংশু দত্ত চৌধুরীর আত্মপ্রকাশ বিদ্যুৎ চমকের মতো নাটকীয়ভাবে হয়েছে। গল্পের রেখ ক্ষণটি তাই উত্তেজনায় টান টান। আগাগোড়া গল্পে পাগলা চৌধুরীর অদ্ভূত মনস্তত্ত্বের করুণ রহস্যঘন জটিলতার ক্রম প্রকাশ আছে। তাই গল্পের ভাব ও একমুখী। আর ভাষা তীব্র নাটকীয়। বিস্ময় মিশ্রিত এককথায় ভাবোপযোগী।

'প্রতিপক্ষ' গল্পে সুখী দম্পতির জীবনে সর্পিল ঈর্ষা তার বিষাক্ত ফণা তুলেছে। আর এই ঈর্ষার জন্য হয়েছে তাদের সুখী দাম্পত্য জীবনে এক প্রতিপক্ষের আবির্ভাবে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই প্রতিপক্ষটি কোন তৃতীয় পুরুষ বা নারী হয়। বরং এই দম্পতিরই সাধনার ধনসঙ্গীত। যে সঙ্গীত একদিন তাদের পরস্পরকে কাছকাছি এনেছিল, সেই সঙ্গীত একদির তাদের প্রেমের প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সঙ্গীত জগতে স্বামী ইন্দুভূষণের জনপ্রিয়তা যত বেড়েছে, তার স্ত্রী শিখা ততই হীনমন্যতায় ভুগেছে। বিশেষত গ্রামোফোন কোম্পানী যখন ইন্দুবাবুর সঙ্গে ডুয়েট গাইবার জন্য শিখাদেবীকে নিতে অস্বীকার করেছে। তখন অপমানে জ্বলে উঠে শিখা নতুন করে তার সঙ্গীত সাধনা শুরু করেছে। কিন্তু সাধ অনুযায়ী সাধ্য তার ছিল না। সুতরাং ইন্দুকে এক করুন প্রহসনে ভূমিকা নিতে হয়েছে। ইন্দু গোপন আর্জি পেশ করে শিখাকে ফাংশানে নিয়ে গিয়েছে। এবং শিখা তার প্রাপ্য দক্ষিণা প্রত্যাশা করলে ত্রিশ-পঞ্চাশ টাকা তার সাম্মানিক হিসাবে দেখিয়েছে। আর শিল্পী হিসাবে এই স্বীকৃতিটুকু পেয়েই শিখা খুশি হয়েছে।

কিন্তু মিথ্যা কখনো চিরস্থায়ী হয় না। শিখা এই সমস্ত কথা জানার পর একেবারে ভেঙে পড়েছে। তাঁর স্ত্রীর এই করুন অবস্থা দেখে ভেবেছে যে গানের চেয়ে সে স্ত্রীকেই বেশি ভালবাসে। তাই সে মনস্থির করেছে – 'গান এসে মাঝখানে প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়াবে আমাদের দুজনকে বিচ্ছিন্ন আর বিশ্লিষ্ট করে দেবে, এ আমি কিছুতেই সইব না। এইখানেই গল্পটির করুণ পরিণতি - শিল্পীসত্তার এমন অপমৃত্যু মনকে আঘাত করে। তবু এই ট্রাজেডির মূলে যে হৃদয় যন্ত্রণার ইতিহাস আছে। তাতে শিখার প্রতিও পাঠক মমতাবোধ করে। আর গল্পের শেষে শিল্পের চেয়েও প্রেম বড় হয়ে ওঠে।

গল্পের নামকরণ সম্বন্ধে বোধহয় এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, 'প্রতিপক্ষ কে বিদায় করতেই গল্প দাঁড়িয়ে পড়েছে। এই প্রতিপক্ষ' কেন্দ্র করে গল্পটি আবর্তিত। গল্পের যাবতীয় হৃদয় সমস্যার মূলেও এই প্রতিপক্ষ'। তাই এর চেয়ে সার্থক নামকরণ আর কি হতে পারত?

"আত্মহত্যা" এটি একটি জটিল মনস্তত্ত্বের গল্প। হৃদয়ের বিচিত্র ভাবাবেগ কিভাবে একটি সুস্থ, সুন্দর, সুখী মানুষকে আত্মহননের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়, সে কথাই এ গল্পে লেখক বলেছেন। এ গল্পে সুখী, কৃতী, ধনী, সুপুরুষ পিনাকী তার সুখের মুহূর্তকে অমর করবার জন্য আত্মহত্যা করেছে। প্রেম ও মনস্তত্ত্বের প্রভাব এখানে সুস্পষ্ট।

পিনাকী তার স্ত্রী সুপ্রভাবে জীবন-সঙ্গিনী রূপে পেয়ে চরিতার্থ হয়েছিল। তার সামনে প্রসারিত সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ তাকে ভীত করেছিল ও সে তার উজ্জ্বল জীবনের দিকে মুখ ফিরিয়ে ভেবেছিল- 'সুন্দর, কী সুন্দর এই জীবনটা।' বারান্দার নির্জনতায় স্ত্রীর উষ্ণ সান্নিধ্যে তার জীবন-প্রীতি আরও গাঢ় হয়ে আসছিল। কিন্তু আচমকা তার স্ত্রী সুপ্রভা যখন পিনাকীকে জানায় যে, ঐ বারান্দা থেকে পড়ে গিয়ে একটি ছেলের মৃত্যু হয়েছিল, মুহূর্তে পিনাকীর জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী বদলে গেল। তার মনে হল সারাজীবন অনিশ্চয়তার মধ্যে যুদ্ধ করার চেয়ে একেবারে সুনিশ্চিত সমাপ্তিই ভাল।

স্ত্রী চলে যেতে একাকীত্বের সুযোগ এই দার্শনিক অনুভূতি তাকে আরও আচ্ছন্ন করল। সে অনুভব করল জরা, মৃত্যু সবই মানুষের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। আর যৌবনে যে ভালবাসা উপভোগের, জরার আগমনের সাথে সাথেই তা যন্ত্রণায় পর্যবসিত হবে। সুখের মুহূর্ত আর ফিরে আসে না এ অমোঘ সত্য উপলব্ধি করে পিনাকী চমকে উঠল ও নিজের ভবিষ্যতে অবহেলিত জীবন কল্পনা স্ত্রী পুত্রের ভালবাসা হারাবার আশঙ্কায় সে শিউরে উঠল।

গল্পটিতে মনের অলিতে গলিতে কোন ভাবনা কেমন বাঁক নেয় তা সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করে দেখানোর উপর জোর বেশি পড়ায় ও তার বিস্তারিত খুটিনাটি বর্ণনার ফলে গল্পের মধ্যে খানিকটা দার্শনিক প্রবন্ধের ভাব এসেছে ও গল্পের নিটোল সংক্ষিপ্ততা তেমন রক্ষিত হয়নি।

'দূর্ঘটনা' এই গল্পটিতে কুরূপা, যৌবন-বঞ্চিতা, অবহেলিতা নারীর অদ্ভুত মনস্তত্ব বর্ণিত হয়েছে। সৌন্দর্যহীনা কুলমিসট্রেস মিস ইন্দিরা চৌধুরীর আর পাঁচটা নারীর মতোই ছিল জৈবিক চাহিদা, আত্মবিকাশের চাহিদা। আত্মপ্রতিষ্ঠার চাহিদা। ভালবাসার চাহিদা। কিন্তু কুরূপা হওয়ায় এইসব চাহিদাপূরণের ক্ষেত্রে তাকে বারবার বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এই বাধার থেকে সৃষ্টি হয়েছে ক্রোধের, এবং হীনমন্যতা থেকে জন্ম নিয়েছে ঈর্ষা। জগদীশ ভট্টাচার্যের ভাষায়- 'তাই স্টিমারের বুঝে তরুন দম্পতির মধুর দাম্পত্যলীলা দেখে তার রক্তের মধ্যে একটা চাপা আক্রোশ হয়ে উঠল।

প্রতিহিংসা কুটিল প্রেতিনীর মতো ঐ তরুণ দম্পতির সুখের সংসারে তার ঈর্ষার আগুন লাগিয়েছে মিস্ ইন্দিরা। যে সুখে সে নিজে বঞ্চিত, দাম্পত্যের সেই মধুর সুখ অন্যে পাবে- তা সে সহ্য করতে পারেনি। তাই স্টোভ দুর্ঘটনার কথা গোপন করে মিথ্যে গল্প বানিয়ে ঐ নব দম্পতির মনে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের কালো ছায়া বিস্তার করে নিষ্ঠুর উল্লাসে। ইন্দিরা চৌধুরী দুরে সরে গেছে।

ভাষা সহজ সুন্দর ও বিষয়োপযোগী মিসট্রেস ইন্দিরার বানানো গল্পে বিশ্বাসযোগ্যতা এসেছে এই ভাষার গুণেই। বঞ্চিতা নারীর ঈর্ষাকাতর মনস্তত্ব বর্ণনায় লেখক মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। গল্পটির নামকরণ যথোপযুক্ত।

'অমনোনীতা' একটি অদ্ভূত জটিল মনস্তত্ত্বের গল্প। সদ্যবিবাহিত লোকেনের সুখী দাম্পত্য জীবনে খুব তুচ্ছ কারণে। সামান্য উপলক্ষে কিভাবে সন্দেহের ছায়া ঘনিয়ে এল। তারই ক্রমবিস্তার আছে এ গল্পে।

এইভাবে আমরা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে জীবনের বিচিত্র দিকের স্ফুরণ লক্ষ করি। জীবনের বহুমাত্রিক প্রবাহ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পকে একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ দিয়েছে।

উল্লেখপঞ্জি:

১. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ: ১৩৫৯, পৃ. ৪১৪।
২. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী (চতুর্থ খণ্ড), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ ১৩৬২, পৃ. ৪৯৭।
৩. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী(দ্বিতীয় খণ্ড), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২, প্রথম প্রকাশ ১৩৫৯, পৃ. ৪৩৭।
৪. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়,পূর্বোক্ত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), পৃ. ৪৯৪।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. মৃণালকান্তি মণ্ডল, কথাসাহিত্যের কিছু কথা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ : রথযাত্রা, ২০১৭।
২. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, কালের পুত্তলিকা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ : আশ্বিন ১৪১৮, সেপ্টেম্বর ২০১১।